১৯৭১
বন্দিশালায় বর্বরতা

বন্দিশালায় বর্বরতা ২
বন্দিশালায় বর্বরতা ৩
বন্দিশালায় বর্বরতা ৪
বন্দিশালায় বর্বরতা ৫
বন্দিশালায় বর্বরতা ৬
বন্দিশালায় বর্বরতা ৭
বন্দিশালায় বর্বরতা ৮
বন্দিশালায় বর্বরতা ৯
বন্দিশালায় বর্বরতা ১০
বন্দিশালায় বর্বরতা ১১
বন্দিশালায় বর্বরতা ১২
বন্দিশালায় বর্বরতা ১৩
বন্দিশালায় বর্বরতা ১৪
বন্দিশালায় বর্বরতা ১৫
বন্দিশালায় বর্বরতা ১৬
বন্দিশালায় বর্বরতা ১৭

১৯৭১
বন্দিশালায় বর্বরতা

সম্পাদনা
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

১৯৭১ বন্দিশালায় বর্বরতা	মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	অজিতা শেহরীন রাজ্জাক
প্রচ্ছদ	আইউব আল আমিন
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Aujeeta Shehrin Razzak
1971-Bondishalay Borborota *(1971-Atrocities in Prisons By)*	Manik Mohammad Razzak
Cover Design	Ayub Al Amin
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	550.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-4-2

উ ৎ স র্গ

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে লক্ষাধিক বাঙালিকে বর্বরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশপ্রেমের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সেসব গৌরমময় ত্যাগের বহুকিছু আজ বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। তদুপরি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের অবদান আজও অম্লান।

প্রাক্‌কথন দুইশত বছরের শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মনে করেছিল; ব্রিটিশদের বিতাড়নের সাথে সাথে যদি হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে, তাহলে তারা হয়ত একটি শোষণহীন ন্যায়সঙ্গত সমাজ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তাদের এহেন ভাবনা খুব একটা অসংগতও ছিল না। কারণ; সেসময় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল পর্যায়ে যারা প্রভুত্ব করছিল তারা সকলেই ছিল ব্রিটিশ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী। আবুল মনসুর আহমদের মূল্যায়নে এই প্রান্তি জনগোষ্ঠীর লোকেরা সকল পর্যায়ে ছিল গ্রহীতা আর উচ্চমার্গীয়রা ছিল দাতা। ব্রিটিশ শাসনামলের বাংলার জমিদারী ব্যবস্থাপনার দিকে দৃকপাত করলে দেখা যায়; সিলেট জেলাকে বাদ দিয়ে বাংলার পূর্ব অংশে মোট জমিদারের সংখ্যা ছিল ৬০ ৯৯৯ জন। এরমধ্যে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ ৫০০ জন। অথচ এই অংশে মুসলমান জনগোষ্ঠীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম জমিদাররা পূর্ব বাংলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে যে রাজস্ব দিত তা ছিল মোট জমিদারি রাজস্বের মাত্র ৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নগণ্য (সিংহ। ১৯৪৭-র বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল। পৃষ্ঠা: ১১১)। এছাড়া পূর্ববঙ্গে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য থাকলেও শহরাঞ্চলে তখনও হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাধিক্য। ঢাকা শহরে ১৯০১ সালে মুসলিম অধিবাসী ছিল শতকরা ৪৫.৫ জন। এদের মধ্যে শিক্ষিত ছিল শতকরা ৯ জন। এই শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজি জানা শিক্ষিত ছিল শতকরা ১.১ জন। (সিংহ। বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্র নাথ বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা: ৫৮)। এহেন অবস্থায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ এতদাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান যে কতটা পতিত পর্যায়ে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক অগ্রগামীতার এহেন প্রেক্ষাপটে শুধু যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুসলমানরাই শোষিত হতো, তেমনটি নয়। সমহারে নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠীর লোকেরাও ছিল শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণি সচেতনতার অনুপস্থিতি হেতু হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শোষিত গোষ্ঠীর কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলত সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিক পথ হয়েছে পরিত্যক্ত।

তৎপরিবর্তে ধর্মীয় বিবেচনায় শোষণ কাঠামোতে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই শিক্ষা-দীক্ষাহীন দরিদ্র মুসলমমানদের কাছে প্রধান শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তথাকথিত আভিজাত্যিক অহঙ্কার সংরক্ষণের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য শাসন বলয়ে অন্তর্লীন হওয়ার অবান্তর ভয়ে ভীত হয়ে বাঙালিদের একক জাতিসত্তা গঠনের সম্ভাবনাকে সমাধিস্থ করা

হলে; কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃবৃন্দের প্ররোচণায় মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহর ঝুলন্ত মূলার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে দারিদ্র্য পীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠী। অতঃপর তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে যে, ব্রিটিশ বিতাড়নের সাথে সাথে যদি হিন্দুত্বের শাসন তথা শোষণ বলয় হতে কোনোভাবে বেরিয়ে আসা যায়; তাহলে তারা একটি শোষণহীন বৃক্ষ ছায়ায় সুখকর নিদ্রার সন্ধান পাবে। ধনবাদী ব্যবস্থাধীনে ব্রিটিশদের থেকে পাকিস্তানিদের কাছে ক্ষমতা কাঠানো স্থানান্তরিত হলে যে মৌলিক অধিকারসহ সার্বিক গণমুক্তির প্রশ্নটি অনিষ্পন্নই থেকে যাবে; সেই বোধের ছিটে ফোঁটাও তাদের মধ্যে ছিল না; ফলত যা হবার তা-ই হয়েছিল। ব্রিটিশদের বিদায়ের পর পূর্বতন শোষণ কাঠামোর শূন্যতা পূর্ণ করেছিল নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি জমিদার, জোতদার আমলা ও মুৎসুদ্দীরা। ময়মনসিংহের হিন্দু স্টেশন মাস্টারের পরিবর্তে পাঞ্জাবি স্টেশন মাস্টারের পদায়নের মতো সর্বত্র একই দৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে এহেন অশুভ প্রবণতার কাফেলায় সামিল হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুযোগ সন্ধানী কর্তারা। ফলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্বাঞ্চলের হতভাগা জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্ন তাসের ঘরের মতো ধসে পড়েছিল। ধনবাদী সমাজে ধর্মীয় জিগির যে
গণমুক্তির সহায়ক নয়; তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার দিকটি পাকিস্তানিরা কখনো আমলে নেয়াই প্রয়োজন মনে করেনি। তাদের কাছে বাঙালিরা উপেক্ষিতই থেকে গেছে। বাঙালিদের বেঁচে থাকার আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে কোনোকিছু ভাবারও প্রয়োজন মনে করেনি তারা। তারা মনে করত; বাঙালি মুসলমানরা যুগে যুগে অগ্রগমী হিন্দুদের দ্বারা শোষিত হয়েছে, এখন তারা পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হবে, এটাই স্বাভাবিক, এমনটাই ছিল তাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন। এছাড়া জাতি হিসেবেও বাঙাদের স্বীকৃতি দিতে তাদের ছিল এন্তার কার্পণ্য। সোজা কথায় যে বাঙালি মুসলমানদের বদৌলতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেই পথকেই তারা দুর্গম করে তুলেছিল।

অতঃপর একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়ার সাথে সাথে তারা স্বরূপে আবির্ভুত হয়েছিল। ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়েও বাঙালিরা আদৃত হয়নি। অধিকন্তু কাইল্যা বাঙালিদেরকে কখনো ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হবে না; এ লক্ষ্যে তারা হয়ে ওঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমনটাও বলে যে ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করেছে বলে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে দিতে হবে, এমন কোনো কথা নাই। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের এহেন অপমানসিকতারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে জাতিগত

নিধনের সূচনা লগ্ন থেকে। যে বাঙালি একে ফজলু হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীজ রোপন করেছিলেন, যে বাঙালি শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম অবিভক্ত বাংলায় মন্ত্রিপরিষদ গঠনের মাধ্যমে মুসলিম লীগের উত্থান গৌরবময় করেছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে উপনীত করেছিলেন; অতঃপর সেই বাঙালিদের তারা গাদ্দার অভিধায় অভিষিক্ত করে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিচিতি থেকে খারিজ করে দিয়েছিল। বাঙালিদের ললাটে হিন্দুত্বের তকমা সেটে দিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনায় বেসামাল হয়ে পড়েছিল। এহেন বিকৃত ভাবনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গনিমতের মাল বলে একই ধর্মের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। শুধু তাই নয়, পাশবিক নির্যাতন করেই থেমে থাকেনি। তাদের মা মেয়ে তুল্য নারীদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে তা বিশ্ব বলয়ে বিরল। হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নানামুখী নিপীড়নের ক্ষেত্রে তারা যা করেছে তা ইতিহাসের সকল বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়েছে। হুংকার দিয়ে বলেছে; এ জাতিকে তারা দাস, ভিক্ষুক ও বেশ্যার জাতিতে পরিণত করবে।

এ লক্ষ্য নিয়ে তারা হত্যা করেছিল ৩০ লক্ষ বাঙালিকে, ২ লক্ষ নারীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, ৯৮ লক্ষ বাঙালিকে ভারতে যেতে বাধ্য করেছিল। আরও কত সহস্র-লক্ষ পরিবারকে যে ভিটাচ্যুত করেছিল তার হিসেব আজও নিকষিত হয়নি। কত সহস্র-লক্ষ বাঙালিকে যে তারা বন্দিশালায় নির্যাতন করেছিল; সেই হিসেবও আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয়নি। নানা কারণে আটককৃত এ সমস্ত বন্দির ওপর তারা যে ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল তা ইতিহাসে বিরল। তারা আটক গর্ভবতী নারীর পেটে লাথি মেরে বাচ্চা বিনষ্টের পর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। মুখে স্পিরিট ঢেলে ম্যাচের কাঠি ঠুকে জ্যান্ত মানুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিংস্র বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে প্রাণ সংহার করেছে। এসব নির্যাতনের ক্ষেত্রে তারা যেমন বয়স বিবেচনায় নিত না, তেমনি বন্দির সামাজিক অবস্থানকেও আমলে নিত না। একজন বাঙালি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও লে. কর্নেলকে সাধারণ সিপাহী দিয়ে যেভাবে বন্দিশালায় নির্যাতন চালিয়েছে, তা বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে বিরল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে যেভাবে সিপাহী দিয়ে বুটের লাথি মেরেছে তা কোনো সভ্য সমাজের জন্য কল্পনাতীত। একইসাথে লুটতরাজ, বন্দিকে নির্যাতন করে অর্থ আদায়, নারীদের শরীর হতে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়া, ইত্যকার ক্ষেত্রে যে ধরনের তস্করতা দেখিয়েছে তা কোনো খান্দানি দস্যুর জন্যও লজ্জাজনক। মুখ্যত বন্দিশালায় নির্যাতিতদের বিষয়াদি মূল প্রতিপাদ্য হলেও এতদ্সম্পৃক্ত অন্যান্য বর্বরতার কিছু বিষয়ও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে এক হিসেবে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা একটি জাতি। দুর্ভাগা এ অর্থে যে বিশ্বের কোথাও এমন কোনো জাতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা তাদের দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষীয় অবস্থানে আছে।

কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশ ব্যতিক্রম। আজও এদেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ (এসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে) দেশটির স্বাধীনতার প্রশ্নে বিতর্কিত ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই গোষ্ঠী হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বলে বসবে; এদেশে কোনো মুক্তিযুদ্ধই হয়নি, পাকিস্তানিরা এদেশে কোনো নির্যাতনই করেনি। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, মূর্খীয় জীবনবোধ ও অপবিশ্বাসের অন্ধত্ব এদেরকে রীতিমতো বিবেকহীন অমানুষে পরিণত করেছে। অনুতাপতো দূর কা বাত, এ নিয়ে তাদের দম্ভেরও শেষ নাই। এদের বিপরীতে যারা আছে; তারাও কি ইতিহাসের সাথে সুবিচার করছে? সে প্রশ্নও আজ প্রশ্ন হয়ে ঘুরছে লাখ শহিদ ও নির্যাতিদের বাড়ির আঙিনায়। কতটা কণ্টকিত পথ পারি দিয়ে, কতটা ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তার কিছুটা জানান দেওয়ার জন্যই মুখ্যত এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস।

এ গ্রন্থের সমস্ত তথ্যই নেওয়া হয়েছে সেকেন্ডারি উৎস হতে। এক্ষেত্রে সিংহভাব লেখাই নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকার হতে গৃহীত। এছাড়া কিছু লেখা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা ও সংকলন হতে। ৫০-৫২ বছর পূর্বে রচিত-লিপিবদ্ধ সেসমস্ত লেখার বর্ণনার পদ্ধতি, ভাষাগত উপস্থাপনা ও বানানগত দিকের অনেক কিছুই আজ পরিবর্তীত। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তিও দৃশ্যমান, যে কারণে প্রতিটি লেখাই প্রয়োজন মাফিক সম্পাদনা করা হয়েছে, কোনো কোনো লেখা পুনর্লিখিত হয়েছে, কোনো কোনো লেখা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তদুপরি কোনো লেখারই মূল্য ভাষ্যের যেমন কোনো বিচ্যুতি নাই, তেমনি নাই মনগড়া কোনো কথা। অধিকন্তু প্রতিটি লেখার শেষেই তথ্যউৎস দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া সকল ক্ষেত্রেই লেখার শিরোনাম প্রয়োজনের নিরিখে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে লেখার মানের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে মনে করি। নালন্দা প্রকাশনীর কর্ণধার রেদওয়ানুর রহমার জুয়েল গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং আইউব আল আমিন প্রচ্ছদ করে দেয়ায় তাঁদের উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা।
marazzaque85@gmail.com

সূ চি প ত্র

হানাদার বাহিনীর-বর্ণনাতীত বর্বরতা ১৩ পাকিস্তানের বন্দিশালায়-ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ২১ লাহোর কোর্টে-নির্যাতিত লে. কর্নেল মাসুদ ২৯ বন্দি শিবিরে আটমাস -সৈয়দ রেজাউল হায়াত ৩৬ সিন্ধের বন্দি শিবিরে-কমান্ডার মহসিন উদ্দিন বতু ৪৯ বন্দি-শিবিরে নির্যাতন-এম. মহিউদ্দিন ৬১ বন্দিশালায় নির্যাতিত-চৌধুরী রওনাকুল বায়েত ৬৬ ফরিদপুর স্টেডিয়াম ক্যাম্পে-নির্যাতিত আনু ৭৪ হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বীভৎসতা-সুবেদার খলিলুর রহমান ৭৯ রাজারবাগ পুলিশ লাইন-খলিলুর রহমান ৮১ রমনা থানায় আগ্রাসন-মতিউর রহমান ৮৩ অবরুদ্ধ মিরপুর: মৃত্যুপুরি-মো. সালেহুজ্জামান ৮৭ মহাশ্মশান: শাঁখারী বাজার-পরদেশি ৮৯ রাজারবাগ নিপীড়ন ক্যাম্প-মিসেস রাবেয়া খাতুন ৯১ নিপীড়নের কেন্দ্র-রংপুর টাউন হল ৯৬ একাত্তরের বন্দিত্ব-মোহাম্মদ আবু নূর ১০০ দালালরাও পায়নি নাজাত-মো. মাহমুদুল আশরাফ ১০২ অপরাধ: নৌকার ভোটার-শরীফ উদ্দিন আহমদ ১০৪ নির্যাতনের নির্মম প্রহর-মো. আরশাদুজ্জামান আশু ১০৫ অকারণে নিপীড়ন-বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় ১০৮ আতাইকুলায় আগ্রাসন-মো. হামিদুর রহমান ১১২ নওগাঁর বন্দিশালায়-মো. সাজ্জাদ হোসেন ১১৪ সিগারেটের ছ্যাকা-বাদশা মিয়া ১১৬ টাকা দিয়ে মিলে মুক্তি-আরিফুর রহমান বাদশা ১১৭ ধ্বংস, ধর্ষণ ও হত্যা-সুকচান ১১৮ নিপীড়িত বীর মুক্তিযোদ্ধা-মো. ছানোয়ার হোসেন ১১৯ অপরাধ: জয়বাংলা বলা-মো. আরব আলী মিয়া ১২৫ লাথি মেরে হত্যা-আলতাফ হোসেন দুলু ১২৭ উলঙ্গ করে ঝোলানো-মো. লুৎফর রহমান ১২৯ মুখে চুন-কালি-মো. সোলায়মান ১৩০ সংহারের আর্তনাদ-রফিকুল ইসলাম ১৩১ গণহত্যা প্রত্যক্ষণ-নাজির উদ্দিন মিঞা ১৩৪ বধ্যভূমি থেকে বেঁচে ফেরা-মো. হাসেম আলী তালুকদার ১৩৫ নিপীড়িত মৌলভী-মো. বছির উদ্দিন আহমদ ১৩৭ অপরাধ: হিন্দুত্ব-শ্রী তারাপদ কুণ্ড ১৩৮ মুক্তিফৌজের সন্ধানে-মো. হাবিবুর রহমান ১৩৯ অপরাধ: মুক্তিদের সহায়তা-খো. জিল্লুর রহমান ১৪০ মা পানি জনপদ-শ্রী রথিকৃষ্ণ সাহা ১৪২ অপরাধ: নৌকার সমর্থক-কাজী আব্দুল খালেক ১৪৫ নানারৈখিক নির্যাতন-এড. শহীদুল ইসলাম ১৪৯ পাঠান সেনার বন্দিত্ব-সৈয়দ আলী ইমাম ১৫২ নির্যাতিত নরসুন্দর-শ্রী গণপতি সরকার ১৫৪ ছালায় ভরে নদীতে নিক্ষেপ-মো. মোহসিন উল্লাহ ১৫৬ নৈতিক স্খলন ও

নিষ্ঠুরতা-লুৎফর রহমান মোল্লা ১৫৮ অপরাধ: সন্তান মুক্তিযোদ্ধা-মো. মানিক শিকদার ১৬০ নজিরবিহীন নৃশংসতা-শ্রী বিনয় কৃষ্ণ দত্ত ১৬২ জীবন্ত পুঁতে ফেলা-আইনুল হক ১৬৫ বিকৃত উল্লাস-অনিল কুমার মণ্ডল ১৬৬ প্রহার করে হত্যা-মো. শহিদুল ইসলাম ১৬৮ পানির বদলে পেশাব-মো. আব্দুল রশীদ মণ্ডল ১৬৯ জবাই হয়েও জীবিত-শ্রী চিনিবাস সরকার ১৭০ নিস্তার পায়নি রাজাকারের মা-মো. খন্দকার নূরুল ইসলাম ১৭১ বেয়নেট দিয়ে হত্যা-মো. রাজাই সরদার ১৭৩ স্পিরিট দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা-আফতাব উদ্দীন আহমদ ১৭৪ লবণ লাগিয়ে নিপীড়ন-ভারতী রাণী বসু ১৭৬ অপরাধ: সন্তান মুক্তিফৌজ-আজহার আলী মিঞা ১৭৯ আগুনে নিক্ষেপন-সন্তষী বালা ঢালী ১৮১ কাঞ্চনা-র করুণ কান্না-শ্রী অমল কান্তি সেন ১৮২ ধান ক্ষেতে পাশবিকতা-মো. সফিকুর রহমান ১৮৪ পুড়িয়ে শিশু হত্যা-জোতিন্দ্র মোহন নন্দী ১৮৫ শাকপুরার শোকগাথা-সন্তোষ কুমার ১৮৬ চোখে মরিচের গুড়া-মোক্তার মোহাম্মদ ১৮৮ পাহাড়তলীর হত্যাযজ্ঞ-মো. সামসুল হক ১৯১ মসজিদে হত্যা-মো. ইদ্রিস ১৯২ নাক ঝুলিয়ে নির্যাতন-মো. আবুল কালাম ১৯৫ আঙ্গুলে সুচ ঢোকানো-মো. আবুল কাসেম ১৯৭ অর্থ দিয়ে অবমুক্তি-ছালেহ্ আহমদ ১৯৮ প্রবীণ রাজনীতিবিদ-শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৯ বীরাঙ্গনা ভাগীরথী-রহিম আজাদ ২০২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-দৈনিক আজাদ ২০৪ খুলনায় নরমেধযজ্ঞ-দৈনিক বাংলা ২০৬ শহিদ মশিউর রহমান-জাতীয় পরিষদ সদস্য ২০৮ অধ্যাপক দেবদাস-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২১১ শহিদ আ. খালেক-ওসি-নুরুল ইসলাম ২১৪ বাঘের খাঁচায়-সিরাজুদ্দৌলা ২১৬ বাঘের খাঁচায় ছয়দিন-সফিকুল ইসলাম ২১৮ বাঘের থাবায় শহিদ-বীরযোদ্ধা সালাহ্উদ্দিন ২২৪ গ্রন্থপঞ্জী ২২৯

হানাদার বাহিনীর বর্ণনাতীত বর্বরতা

ব্রিটিশদের বিদায়ের আগ দিয়ে ১৯৪৬ সালের ৯ জানুয়ারি হতে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশের আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস ১৫৮৫ টি আসনের মধ্যে ৯৩০টি আসনে জয়ী হয়ে ৮টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যে ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস বিজিত হয়েছিল সেগুলো হলো; আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বে (মুম্বাই), মাদ্রাজ (চেন্নাই) ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। অপরদিকে মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ৪৯২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪২৮টি আসনে জয় লাভ করেছিল। মুসলিম লীগ বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। তদুপরি বাংলা ব্যতীত মুসলিম লীগ কোনো প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সরকার গঠনে সমর্থ হয়নি। সেসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ একক দল হিসেবে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। সে সুবাদে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি সংহত হয়েছিল। (ইতোপূর্বে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক) অর্থাৎ বাঙালিরাই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তানের নয়া সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনআইনের আলোকে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। পরিতাপের বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানিরা সে পথে হাঁটেনি।

সূচনা থেকেই তারা হেঁটেছে প্রভুত্বের পথে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম হলেও উদার মনের বাঙালিরা তা প্রসন্ন চিত্তে মেনে নেয়। বিশ্বাস ছিল; ধর্মগতভাবে একই পরিবারভুক্ত পাকিস্তানিরা তাদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সমস্যাগুলোর সুরাহা করে একটি উন্নত জীবনের সংস্থানে সচেষ্ট হবে। কিন্তু বাঙালিদের ভাবনায় ভুল ছিল। বাঙালিদের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার পরপরই বাঙালিদের অবদান বিস্মৃত হয়ে নিজেদের প্রভু ভাবতে শুরু করে। সে নিরিখেই চালাতে থাকে পাকিস্তানকে। এই অপপ্রয়াসের প্রতিবাদ হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ চরমভাবে (ওই নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩০৯ টি, এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি। যার মাত্র ৯ টিতে জয়ী হয়েছিল মুসলিম লীগ) বাংলার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয় এবং প্রদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট হতে পুরোপুরি উৎপাটিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের

প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয়দফা ব্যাপক পরিসরে বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে স্বীকৃত হয়। একই প্রশ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয় (৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি আসনে জয়লাভ করেছিল)। এটি কোনো সরকার গঠনের নির্বাচন ছিল না। এটি ছিল সংবিধান প্রণয়নের নিমিত্ত সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের নির্বাচন। বাঙালি জাতির ক্ষমতায়নের প্রাথমিক ধাপ। তদুপরি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেনি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা হারাবার শঙ্কায় তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতির ক্ষমতায়নের বিষয়টি তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। অতঃপর বল প্রয়োগের পথকেই বেছে নেয় তারা। একটি জাতির জাগরণকে শত বছরের জন্য স্তব্ধ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র জাতির ওপর। তৎপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষিত হলে; শুরু হয় বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম।

অতঃপর যে বাঙালি জাতির বদৌলতে পশ্চিমারা পাকিস্তান রাষ্ট্র হাসিল করতে কামিয়াব হয়েছিল; সেই বাঙালি জাতিকে তারা গাদ্দার অভিধায় অভিষিক্ত করতে দ্বিধা করেনি। যেই বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে একসময় তারা গর্ব করেছিল, ধর্ম নির্বিশেষে সেই বাঙালি নারীদের ওপর গনিমতের মাল হিসেবে পাশবিক নির্যাতন চালাতে দ্বিধা করেনি। এরপরের ইতিহাস পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস। একইসাথে সেই ইতিহাস বাঙালি জাতির লড়াই সংগ্রামের গৌরবময় বীরত্বের ইতিহাস। প্রকাশ থাকে যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল একটি প্রশিক্ষিত প্রফেশনাল বাহিনী। এ ধরনের বাহিনীর নীতি-নৈতিকতার মান উচ্চমার্গের হওয়া অভিপ্রেত হলেও এক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। এরা আদিম মানসিকতাসম্পন্ন স্বাধীন দেশের অনুপযোগী অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির সেনাবাহিনী ছিল। এরা ছিল ইয়াজিদ ও মধ্যযুগীয় চেঙ্গিস বা হালাকু খানের বাহিনীরই মতো বর্বর ও নৃশংস। এদের মধ্যে সভ্যতা, ভদ্রতা ও মানবতার লেশ মাত্র ছিল না। অতঃপর বাংলাকে বাঙালি শূন্য করার এক অলীক স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানি হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর। বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে কুখ্যাত টিক্কা খান পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক হবার পর যেমনটা বলেছিল; 'মুঝে আদমি নাহি চাইয়ে-মিট্টি চাইয়ে।' তেমনটি করেছিল তার লেলিয়ে দেওয়া বর্বর সৈন্যরা। বাঙালি শূন্য করার মিশন সফল করতে মেতে উঠেছিল গণহত্যায়। পরবর্তী সময়ে সেনা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আসে লে. জেনারেল এ কে নিয়াজি। এই কুখ্যাত জেনারেল নৈতিক দিক দিয়ে ছিল অতীব নিম্ন প্রকৃতির। সৈন্যদের ধর্ষণের বিষয়ে তার ছিল প্রচ্ছন্ন সমর্থন। নিজেও ছিল একই প্রকৃতির লম্পট। সে প্রকাশ্যে বলত; আমার সৈন্যরা যুদ্ধ করবে এখানে আর

সঙ্গমের জন্য যাবে ঝিলামে, তা কী করে হয়। এ ধরনের মানসিক বিকারগ্রস্ত সেনা প্রধানের অধঃস্তনরা যে তারই মতো হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

প্রকাশ থাকে যে দুই হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আগত এই হানাদার সেনারা বাঙালির ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও সার্বিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রাস্তাঘাটও চিনত না। চিনত না শত্রু-মিত্র। বাঙালিদের ভাষাও বুঝত না। এই ঘাটতি পূরণ করেছিল স্থানীয় দালালরা। এই বেইমানরা এভাবে পাশে না দাঁড়ালে হয়ত আরও আগে হানাদারদেরকে বিদায় নিতে হতো। এদেরই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হানাদার সেনারা আপামর জনগোষ্ঠীর ওপর নানারৈখিক নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছিল। এমনও দেখা গেছে; তারা একজন বন্দির ওপর **১৯** ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। সেইসময় পাকিস্তানের বন্দিশালা, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বন্দিশালা ও বিভিন্ন জনপদে আগ্রাসনকালে স্থানীয় রাজাকারসহ হানাদার সেনারা যে ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল-তার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো;

১. **অন্ধকার কক্ষে পীড়ন :** অনেক ক্ষেত্রে বন্দিদের ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে অবরুদ্ধ করে মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন চালাত। কোনো কোনো সময় এসব ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বিকট কান্নার শব্দের ক্যাসেট চালিয়ে দিত। যা বন্দিদের মনোজগতকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিত।

২. **অশালীন ভাষায় গালাগালি :** নির্যাতনকালে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করত। তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত চলত শারীরিক প্রহার।

৩. **আঙুল কর্তন:** শুপারি কাটার ছোরতা দিয়ে আঙুল কেটে দিত। হাতুড়ি বা ভারী কিছু দিয়ে আঙুল থেতলে দিত।

৪. **ইলেকট্রিক শক :** গুরুত্বপূর্ণ বন্দিদের নির্যাতনের ক্ষেত্রে শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে দুইহাতে ইলেকট্রিক সংযোগের মাধ্যমে যেমন শক দেওয়া হতো, তেমনি অন্যান্য স্পর্শকাতর অঙ্গেও শক দেওয়া হতো। বুকের স্তনের বোঁটায়, পায়ুপথে ও পুরুষ লিঙ্গের প্রস্রাবের ছিদ্রে বৈদ্যুতিক তার সংযোগের মাধ্যমে শক দিয়ে ভয়াবহভাবে যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন করা হতো।

৫ **উলঙ্গকরণ :** নির্যাতনকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতিতকে উলঙ্গ করা হতো। এরপর চালানো হতো নানারৈখিক নির্যাতন। কখনোবা উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখত।

৬. **এসিডে ঝলসানো:** আটকের পর বন্দিশালায় নির্যাতনকালে এসিড মেরে শরীর ঝলসে দিত।

৭. **কিল-ঘুসি:** কুল ঘুসি ছিল হানাদারদের অতিসাধারণ একটি নির্যাতন। কাউকে আটক করার পরপরই তারা কিল-ঘুসি মেরে নির্যাতন পর্ব উদ্বোধন করত।

৮. **কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা:** আটক করার পর রাস্তার ফেলে আদিম কায়দায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করত।

৯. **কায়িক শ্রম:** বন্দিদের দিয়ে অনেক ধরনের কায়িক শ্রম করিয়ে নিত। তাদের দিয়ে দিয়ে ঘাস কাটাত, জঙ্গল পরিষ্কার করাত, বাঙ্কার খুড়িয়ে নিত, মালামাল বহন করাত, এমন কি থালা-বাসন মাজাত, টয়লেট ও ঘর পরিষ্কার করাত।

১০. **খাদ্যগত নির্যাতন:** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দিদের নিয়মিত খাবার দেওয়া হতো না। দীর্ঘসময় ধরে অভুক্ত রেখে কষ্ট দেওয়া হতো। ক্ষেত্র বিশেষে দেওয়া হতো পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার। এসব খাবার খেয়ে অনেকের দেখা দিত পেটের পীড়া। বাঘের খাঁচায় যারা বন্দি থাকত তাদেরকে খাবার হিসেবে দেওয়া রুটি বাঘের পেশাবের ওপর ছুড়ে দেওয়া হতো।

১১. **গরম পানিতে মাথা চুবানো:** হাত পা বাঁধা অবস্থায় পা সিলিংয়ে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় ফুটন্ত পানিতে মাথা-মুখ চুবিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাত।

১২. **গান গাইতে বাধ্য করা:** পিতাকে হত্যার পর শোকাহত কন্যাদের গান গাইতে বাধ্য করে মানসিকভাবে পীড়ন করত।

১৩. **চাবুক দিয়ে প্রহার:** বন্দিদেরকে চাবুক দিয়ে চাপকানো ছিল হানাদারদের বহুল চর্চিত একটি মধ্যযুগীয় নির্যাতন পদ্ধতি।

১৪. **চোখ উপড়ে ফেলা:** অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনকালে বেয়নেট দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলত।

১৫. **ঝুলিয়ে নির্যাতন:** হাত পা বেঁধে গাছের ডালে বা ঘরের সিলিংয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখে চাবুক দিয়ে আঘাত করা, রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার করা, লাঠি দিয়ে প্রহার করা বা কলি ঘুসি মারা ছিল একটি বহুল চর্চিত পীড়ন। ঝুলন্ত অবস্থায় ইচ্ছেমাফিক যখন তখন নানা ধরনের পীড়ন করত। বেয়নেট দিয়ে শরীর কেটে দিত। ঝুলন্ত অবস্থাতেই বন্দিদেরকে পায়খানা প্রস্রাব করতে হতো। অনেক মেয়েই নির্যাতন সইতে না পেরে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

১৬. **জ্যান্ত অবস্থায় হত্যা:** জ্যান্ত অবস্থায় পানিতে ফেলে, মাটি চাপা দিয়ে, আগুনে নিক্ষেপ করে কিংবা শরীরে আগুন ধরিয়ে হত্যা করত।

১৭. **দাঁত ভাঙা:** ঘুষি মেরে বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে দাঁত ভেঙে দিত।

১৮. **পাশবিক ধর্ষণ:** নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্ষণই ছিল তাদের অগ্রাধিকারমূলক মাধ্যম। এসব ক্ষেত্রে তাদের চক্ষু লজ্জার কোনো বালাই ছিল না। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায়, ধানের ক্ষেত্রে, বাড়ির আঙিনায় নারীদের বিবস্ত্র করে তারা বীভৎস ধর্ষণে লিপ্ত হতো। এ ক্ষেত্রে কোনো বয়স বিবেচ্য ছিল না। গর্ভবতীদেরও ছাড় দেওয়া হতো না। পিতার সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করত। লাগাতার ধর্ষণের ধকল সইতে না পেরে অনেক